৪

সংবাদ

তারিখ ... JUN 17 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি

প্রফেসর শিশির কুমার ভট্টাচার্য

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট মিলে মোট ৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এ সংখ্যা অচিরেই আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ্ধতিগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রাইভেট বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল প্রকাশ করা হয়ে থাকে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত শ্রেণীভিত্তিক ফল দেয়া হয়, যদিও কিছু কিছু বিভাগে গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ফল প্রকাশের এ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার সঙ্গে দেশের উচ্চশিক্ষার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হবে। তার মানে বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের কোন আন্তর্জাতিক যোগসূত্র নেই বা আমাদের শিক্ষাবিদরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোন কোন অবদান রাখতে পারছেন। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও বোধহয় শিক্ষা জগতে একঘরে। আমেরিকা বিত্তশালী দেশ। আমেরিকা ও তার ছত্রছায়ার দেশগুলোতে গ্রেডিং পদ্ধতি চলছে। আমাদের দেশেও গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হলে আমাদের সন্তানরা হয়তো লাভবান হবে। সম্ভবত এ দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত। তবে সিদ্ধান্ত যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তা চাপিয়ে দেয়া যায় না। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় হলো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এখানে শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা পরিষদ (Academic Council) রয়েছে। কাজেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে হলে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিক্ষা পরিষদকেই নিতে হবে। তবে ক্ষমতাসীনরা যদি শিক্ষা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপন সিদ্ধান্ত চালু করে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা ক্ষমতাসীনরা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তার পরিচয় জোট সরকারের জন্মলগ্ন থেকেই পাওয়া গেছে। ক্ষমতাগ্রহণের পরপরই যেভাবে নির্বাচিত উপাচার্যদের সরিয়ে 'পূর্ণ মেয়াদের' জন্য দলীয় উপাচার্য নিয়োগ করেছেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। উপাচার্যের অপসারণ আগের সরকারের আমলেও হয়েছে। তবে তা ছিল বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে। সে নিয়োগের প্রধান শর্ত ছিল যথাসম্ভব দ্রুত সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্যের প্যানেল নির্বাচিত করা। এখানেই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য।

গৃহীত সিদ্ধান্তে ১০টি গ্রেডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ১০টি গ্রেড এবং গ্রেড পয়েন্ট হলো : (৮০-১০০) এ+, ৪; (৭৫-৮০) এ, ৩.৭৫; (৭০-৭৫) এ-, ৩.৫; (৬৫-৭০) বি+, ৩.২৫; (৬০-৬৫) বি, ৩; (৫৫-৬০) বি-, ২.৭৫; (৫০-৫৫) সি+, ২.৫; (৪৫-৫০) সি, ২.২৫; (৪০-৪৫) ডি, ২; সর্বশেষ ৪০-এর নিচে হলে এফ গ্রেড ধরা হবে যার গ্রেড পয়েন্ট শূন্য মানে ফেল। শ্রেণীভিত্তিক পদ্ধতিতে মেধা অনুসারে পরীক্ষার্থীদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শতকরা ৬০ বা তদূর্ধ্ব নম্বরের জন্য প্রথম শ্রেণী, ৬০-এর নিচে ৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণী, ৪৫-এর নিচে ৩৬ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণী দেয়া হয়। শতকরা ৩৬-এর কম পেলে ফেল বলে বিবেচিত। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হলে তাৎক্ষণিক সমস্যা দেখা দেবে যারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পয়েন্ট পেয়ে পাস করে বেরিয়ে গেছে গ্রেডে তাদের সমতুল্যতা নিয়ে। নম্বরের ভিত্তিতে এই সমতুল্যতা নির্ধারণ সমীচীন হবে না। কেননা দুই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বরের গুরুত্ব সমান নয়। শ্রেণী পদ্ধতিতে যারা প্রথম শ্রেণী লাভ করে তারাই সমাজের প্রথম ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রী বলে বিবেচিত। অতএব প্রথম শ্রেণীর সমতুল্য গ্রেড হতে হবে এ বা এ+। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমতুল্য গ্রেড বি, বি+, এ- এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমতুল্য গ্রেড সি, সি+, বি- হওয়া উচিত।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ একটা পার্থক্য আছে। শুধু ফল

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে

প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, অবকাঠামো, কোর্স প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স প্রণয়ন করে কমিটি অফ কোর্সেস। এ কমিটিতে বিভাগীয় সব শিক্ষক ছাড়াও বহিরাগত সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। উদ্দেশ্য, সিলেবাস প্রণয়নে মানের আন্তর্জাতিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন কোর্স শিক্ষক এবং একজন বহিরাগত শিক্ষক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চূড়ান্ত করা হয় পরীক্ষা কমিটিতে। দুই পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে বেশি মাত্রার পার্থক্য হলে তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র পরীক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মেধার প্রকৃত মূল্যায়নে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে অনেক ধাপ পেরোতে হয়। পক্ষান্তরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্রকরণ এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন কোর্স শিক্ষক এককভাবে। কোর্স প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকাই অনেকাংশে মুখ্য। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় ভাল গ্রেড পেলে কর্তৃপক্ষও খুশি এবং ছাত্রছাত্রীরাও খুশি। এমনকি সবাই এ গ্রেড পেলেও তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করলে বা নিচু গ্রেড পেলে শিক্ষককে জবাবদিহিতা করতে হয়। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো, এসব ছাত্রছাত্রী বেশি টাকা দিয়ে পড়তে এসেছে কি ফেল করার জন্য। আমার কয়েকজন বন্ধুর কথা জানি যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা থাকতে পারেননি। পরীক্ষার্থীদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তা তারা মেনে নিতে পারেননি। বস্তুতপক্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় পদবাচ্য কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। ঢাকাসহ বড় বড় শহরে অলিতে-গলিতে যেভাবে একটার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয় দেখা যায় তাতে মনে হয় এগুলো 'বিশ্ববিদ্যালয়' নয়। যেন রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এক একটা দোকান। ডিগ্রি বিক্রির দোকান। এক একটা দোকানে দুটো, তিনটে, পাঁচটা, সাতটা বা তারও বেশি ডিগ্রি বিক্রি করা হয়। প্রত্যেক ডিগ্রির দামও আলাদা। আমরা সেকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা সম্পর্কে যারা প্রাচীনপন্থী তাদের কাছে এসব প্রতিষ্ঠানকে 'ইউনিভার্সিটি' এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানকে 'উপাচার্য' বলে মেনে নেয়া কষ্টকর।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ